
সমীর কর্মকার

আঁকিবুকি

সমীর কর্মকার

৮ই মাঘ, ১৪৩০

Aankibuki

by Samir Karmakar

ISBN: 978-93-6128-526-4

প্রথম প্রকাশ: ৮ই মাঘ, ১৪৩০ (ইং. ২৩শে জানুয়ারি, ২০২৪)

বিনিময় মূল্য নেই। পড়ে আর দেখে ভালো লাগলে, আপনার সামর্থ্য মতো যা দাম হতে পারে বলে মনে হয় সেটা ৯৮৭৪২৮২২৮০তে পেটিএম বা গুগুল পে করে দিলেই হবে। না পাঠালেও হয়। যদি কিছু পাঠান, তাহলে তার স্ক্রীনশট নিজের নাম ধাম সমেত WhatsApp করতে ভুলবেন না।

প্রচ্ছদ: পিপলি

অলংকরণ: সমীর

গ্রন্থস্বত্ব: রুনু, পিপলি, বকুল, 🐶

প্রাপ্তিস্থান: ৯৮৭৪২৮২২৮০

প্রকাশক:

সমীর কর্মকার

সৃষ্টি, ১২২/১এ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা ৭০০০৯২

চলভাষ: ৯৮৭৪২৮২২৮০, ইমেল: samir.krmkr@gmail.com

রুনু, পিপলি, বকুল, 🐶

আর

বুড়োমানুষী এখনো যাদের স্পর্শ করতে পারেনি তাদেরকে

সূচি

ছড়িয়ে পড়ার আগে, কিছু ছড়ানো কথা:
না পড়লেও চলে

ছড়ার কোনো মুহূর্ত হয় না। ছড়া যতোটা না খেয়াল - তারও থেকে বেশি যেন বা বেখেয়াল। ছড়ার শরীর জুড়ে দিন-প্রতিদিনকার জীবনের সাদা মাঠা শব্দের আলোয়ান - যদিও তারা আচরণে অদ্ভুত।

ছড়ার কৌলীন্য নেই। ছড়া যতোটা না বৈষয়িক তারও থেকে বেশি ছান্দসিক। সে চলে ছন্দের টানে। ছন্দের টানে শব্দেরা সব হুড়মুড়িয়ে পড়ে। বিষয় ভাবনার আগাম পরিকল্পনাগুলো ভেস্তে দেয়। তার বদলে ছন্দের কাঠামোতে এনে হাজির করে ভাবনাদের গরমিল। ছড়ায় ছন্দের স্বৈরাচার তাই সর্বজনবিদিত একটা বিষয়।

ছড়ার ছন্দ কবিতার ছন্দ থেকে অবশ্য আলাদা। ছড়ার ছন্দ অনেক বেশি করে যেন মাটির কাছাকাছি। যে জীবন অ-গণ্যতার অপরিচয়ে তীব্রভাবে দুর্ভিক্ষ বা ধর্মঘটেও হ্যাংলার মতো বাঁচে, ছড়ার ছন্দ সেই জীবনকে ছুঁয়েই থাকে। গুটিকয় ছড়ারই সৌভাগ্য হয়েছে ড্রয়িং রুম বা বুকশেলফের শোভা বর্ধন করার। ব্যতিক্রমী দুই একটি বাদ দিলে অধিকাংশই সস্তার কাগজে ছাপা। প্রচ্ছদেও একটা একঘেঁয়ে বিবর্ণ ক্যাবলামি - লক্ষ করা যাবে। বিনিময় মুল্যেও যেন একটা কুণ্ঠার ছাপ।

কেন জানি না বিশ্বাসই হয় না - ছড়াও গভীর জীবনবোধের কথা বলতে পারে। ছড়ায় কেমন জানি একটা ছ্যাবলামি ছ্যাবলামি ব্যাপার আছে। যদি বা কিছু গভীর বলে - তাও ছ্যাবলামির ঢঙে।

কবিতা আর ছড়ার পার্থক্যটা খানিক মানুষের ডাক্তার বনাম ভেটেনারি ডাক্তারের মতো। কবিতা যদি ডাকাতিয়া বাঁশি হয় তাহলে ছড়া নিশ্চিত ভাবেই সিঁদকাঠি। ছড়া কোন পুরস্কার কোন সরকারি স্বীকৃতির পথ চেয়ে বসে থাকে না। থাকে না কারণ ছড়া ছোটো খাটো আনন্দেই খুশি। এমন তো কতো ছড়াই আমরা জানি যারা একের অধিক দ্বিতীয় কোনো পাঠক দেখে নি। ছড়া জানে সে ইতিহাস হবে না। কারণ ছন্দ বড়ো শারীরিক। তাই সাময়িকও। অথচ, ছড়াদের মতোই অগণ্য নগন্যের কাঁধে চেপেও ইতিহাস সিঁড়ি চড়ে।

ছন্দের প্রয়োজনই ছড়ায় বড়ো করে দেখা দিয়েছে। তাই মাপজোখ করে শব্দের বরাত দিতে হয়। তাইতে আবার রয়েছে ছ্যাবলামির ঠাট বজায় রাখার বাধ্য বাধকতা। তাই, শব্দের বায়না দিয়েই ক্ষান্ত থাকলে হয় না। বাক্যে বা পংক্তিতে শব্দক্রমের অদল বদল করে দেখতে হয় ছ্যাবলার সুরে সুর মিললো কিনা।

শরীরের ভাষাকে সদা ভঙ্গুর রাখতে হয় ছড়াকে। তাই গাম্ভীর্য আসার সম্ভাবনা তৈরি হলেই বাক্যের গঠনে পদের বিন্যাসের হেরফের করে সামাল দিতে জুটে যায় - তা সে যতোই ব্যাকরণগত কৌলিন্যের পরিপন্থী

হোক না কেন! দল বা অক্ষরের গঠনেও চালাতে হয় অন্তর্ঘাত। গম্ভীর মার্জিত চলনে আমদানি করতে অন্য মাপের গড়াগড়ির কথা। স্বভাবতই, বিশিষ্ট সভ্য ভব্য বিষয়গুলির বিপরীতে ছড়াদের বাস।

এখানের যেটুকু বা যাটুকু লেখা - সবটায় নিজের কিছু ভাবনা। ভাবনাগুলো খুব স্বাভাবিভাবেই কোনো না কোনো সামাজিক প্রক্রিয়ার প্রতিফলন। এই ভাবনাগুলো যে মৌলিক বা নতুন তা বলবো না। এই ভাবনাগুলো পুরোনো। প্রায় সকলেরই জানা। চেনা জানা ভাবনাগুলোকে বলার একটা চলতি ধরন আছে। সেই ধরন ছেড়ে অন্য ধরনে কথা বললে চেনা ভাবনাগুলোও অচেনা লাগে। চেনা কথার জগৎ ছেড়ে অন্য কথার জগতে গিয়ে হাজির হওয়াটা তাই সবসময় ভ্রমণের মতো মনে হয়েছে। শব্দের ক্রমে রদবদল ঘটিয়ে বা বাক্যকে ভেঙেচুরে লেখার মধ্যে দিয়েই - এই ভ্রমণ। চেনা জানা ভাবনাদের শহর গ্রাম ছেড়ে, অচেনা উপত্যকায় চলতে থাকে গতায়াত।

শব্দের ভিন্ন প্রয়োগ, বাক্যের ভিন্ন গঠন, বানানের অন্য শরীর কেবলমাত্র যে ভাষার সাথেই আমাদের নতুন করে জোড়ে - তা নয়। ভাষার প্রয়োগ মোতাবেক বদলে যেতে পারে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা। এমন কি বদলাতে পারে, আমার সাথে আমারই চেনা জানা মানুষদের সম্পর্কটাও। কারণ, ছন্দ ছড়া কোবতে গপ্পো ইত্যাদি সকলেই প্রাথমিকভাবে কথন ক্রিয়া। যেকোন কথন ক্রিয়ার মতোই, এরা এদের কথনের সাথে সাথেই বয়ে আনে একটি স্বতন্ত্র ভাবনার জগৎ। যে ভাবনার জগৎ অধিকাংশ সময়েই

ব্যক্তিক চরিত্রের। চলতি ভাষার ব্যাকরণ থেকে ছন্দ ছড়ার ভাষা তাই আসলে এক ধরনের প্রস্থান। আর প্রস্থান বলেই খুব সম্ভবত ভাষান্তরে যেতে যেতেই মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কগুলোকে ঝালিয়ে নেওয়ার অবকাশ তৈরি করে। নির্মিত এই অবকাশে ফারাকের দিকটি যেমন স্পষ্ট করে ভাবনা, ঠিক তেমনই মিলের দিকে সামঞ্জস্য বিধান করে ছন্দ।

বাক্যের চৌহদ্দি নির্ধারণে ভাবনার পূর্ণতা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিশেষত, যখন থেকে ব্যাকরণের হিড়িক জেগেছে তখন থেকে। বাক্যে প্রকাশিত ভাবনা যেমন পূর্ণ হবে, ঠিক তেমনি তার উদ্দেশ্য থাকবে। থাকবে বিধেয় একটা ক্রম মেনে। তার মধ্যে আবার কারক অনুযায়ী নামপদ ও ক্রিয়াপদগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত থাকবে। সাধারণত, কর্তাকে অনুসরণ করে কর্ম। শেষে বসে ক্রিয়া। অধিকরণ ও করণ পর পর কর্তা ও কর্মের মধ্যে বসে যেতে পারে। বিশেষ্যের আগে বিশেষণ, কিন্তু পরে বসে অনুসর্গ। মজার বিষয় হলো, ছন্দের টানে চলতে গেলে, এই সকল হিসাব হামেশাই গোলমাল হয়ে যায়। তাতে করে ভাবনার গঠন সৌকর্যের প্রতি কোন অন্যায় করা হয় বলে তো কখনো মনে হয় নি। বরং, সৌন্দর্য্য বর্ধন হয়েছে। অতি সাধারণ কথা ব্যাকরণের হিসেব কষে গল্প করতে বসলে পান থেকে চুন খসার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত থাকতে হয়। অথচ, সেই একই গল্প যখন কিম্ভুতের মতো চেহারায় হাজির হয় তখন কেবল যে মজার বিষয়টিরও আমদানি হয় তা নয়, অর্থের অনোন্যতাও প্রকাশ পায়। ব্যাকরণের অমোঘ নিয়ম যখন বাক্যকে

ঘিরে থাকে, ছড়ায় ছন্দে গানে কবিতায় কথার মাধুর্য্য তখন বেনিয়মের আবাহনে মগ্ন।

ছন্দে কথা বলতে চাওয়ার এই উদ্যোগের মূলে নিজের আজন্তেই কখন যেন জুটে বসেছিল - নিজেকেই নিজের খোঁড়া খুঁড়ি করে খুঁজে পাওয়ার নেশা। নিজের চির চেনাকে অচেনা করে তুলে ফের তাকে চেনার জগতে সামিল করার এই নেশায় বদলাতে বদলাতে গেছে ভাবনার উপত্যকাগুলো। আমিও দিকভ্রষ্ট পথিকের মতো যখন যেমন তখন তেমন হেঁটেছি। ছবি তুলেছি। বলা ভালো, ছবিও তুলেছি।

ছড়ার মতো ছবিগুলোতেও এক ধরনের ভ্রমণের কথা আছে। ২০১৪র সাগরদ্বীপের এক বৃদ্ধার মুখের বলিরেখাগুলি বেছে, বহু পুরনো এক ভগ্নপ্রায় বাড়ির ইঁট পাঁজরে চারিয়ে যাওয়া শেকড়ের ছবির রেখাগুলো মিলিয়ে দেওয়া - আসলে কেবল মাত্র কোনও তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা থেকে নয়। বরং, সেই ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা থেকে। কাল আর ভূগোলের দুটি আলাদা অসম্পর্কিত দৃষ্টিকোণের রেখাগুলোকে মিলিয়ে দেওয়াটাকেই বুঝতে চেয়েছি এখানে। শব্দের সাথে শব্দের মিল খুঁজতে গিয়ে যেমন সুরের স্বার্থে অর্থের থেকেও অক্ষর বা দল প্রাধান্য পেয়েছে বেশি, ঠিক তেমনই ছবির প্রক্রিয়াকরণে বাস্তব পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করেই সম্পর্কিত দৃশ্যরূপগুলোকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফলস্বরূপ, দৃশ্য ও ভাবনার যে চলতি ইতিহাস আঁকায় লেখায় ধরা পড়ার কথা - তা হয়তো

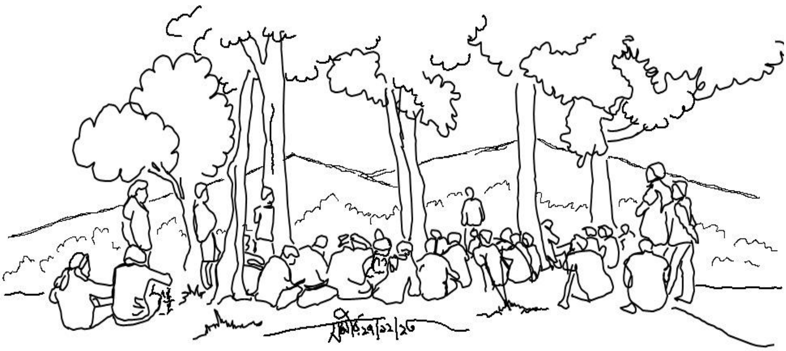
পড়ে নি। কিন্তু, অনন্য এক প্রস্থানের প্রসঙ্গকে এনে হাজির করেছে বলে মনে হয়।

আঁকিবুকির ছড়া আর ছবি, ভাবনা আর ছন্দ - সকলেই আসলে কোনও না কোন একভাবে অসামঞ্জস্যের কথা বলে। স্থান আর প্রস্থানের কথা বলে। সমসাময়িক যে সকল বুদ্ধিজীবী সুলভ ক্যাবলামোপনা, আত্মরতি, রাজনৈতিক ধ্যাস্টামো, পরস্পর বিরোধী অবস্থানের আবহে আমাদের চাষবাস, সেইখান থেকে উঠে আসা গুরুচন্ডালি দোষে দুষ্ট দিন-প্রতিদিনকার ছাপোষা ভাষা আর ছবি তাই ছড়িয়ে পড়ার আগে ছারখার করে দিতে চায় ছড়াকার আর ছবিকারকেও।

সমীর কর্মকার

৮ই মাঘ ১৪৩০

ওরা



গাছের তলায়। পাথর টিলায়।

লোক জমেছে।

বনের ধারে। নদীর পাড়ে।

প্রাণ ঢেলেছে।

ঝোপে ঝাড়ে, কথার ভীড়ে

কারা জেগেছে?!

আমরা

আমরা যারা হতচ্ছাড়া
এই পুরেতে থাকি,
আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল
যেইটুকু যা বাকি।
আমরা হাসি, আমরা খুশি,
আমরা ছলাৎ ছল,
এই জোয়ারে এই যে ভাঁটায়
আমরাই চঞ্চল।
এই হিসেবী! কি মিশাবি?
জলের সাথে তেল?
দেখতো দেখি কাকটা কোথায়
পাকলো যখন বেল!
লালচে কিংবা স্বাধীন ফাঁকি?
কিই বা এসে যায়!
সস্তা মেকি ফালতু নাকি?
উড়বো এবার তাই...

খননজীবী

গর্ত খুঁড়ে, গর্ত খুঁড়ে,
দিনের বেলাও, আঁধার মেখে,
ইঁদুর যেমন চলতে থাকে,
পায়ের নিচে। মাটির তলে।

খালি হাতে। মাটি খুঁড়ে।
কয়লা তোলে।
তবেই তো তার, রান্নাঘরে
উনুন জ্বলে, আগুন জ্বেলে।

রুক্ষ মাটি। শুষ্ক পাথার।
দমবন্ধ। শুধুই আঁধার।
ছেনির ঘায়ে, দেওয়াল ভাঙে
ফাটিয়ে আঁধার, সূর্য আনে।

সেই সে কাছে, তবুও দূরে
উঠছে যেন মাটি ফুঁড়ে।
নয়তো কালো, তপ্ত ভালো
হাতের ছোঁয়ায় জাগছে আলো।

যন্ত্রটা তো সেই সেখানে
মাটির নিচে স্তব্ধ গানে
তোমরা তবু মাটির নিচে
আনছো জীবন হেঁচকা টানে

গর্ত খুঁড়ে, গর্ত খুঁড়ে...

.

আমি যেমন

শব্দ খুঁজে জব্দ করা বেশ লিখেছি গদ্য।
তথ্য ঠাসা সর্বনাশা অদ্ভুতুড়ে পদ্য।
প্রবন্ধটা? তাও লিখেছি। খাটিয়ে মাথা বেশ।
গানটা গেয়ে অল্পেতে তাই ভাবছি করবো শেষ।

ছবির কথা? বলবো কি ভাই! সেটাও আমিই আঁকি।
রং বেরঙের উদ্ভট সব ভাবনাগুলোই ফাঁকি।
ছড়া লিখি। ফটোও তুলি। চায়ের কাপে ঝড়।
টেবিল চাপড়ে, মানুষ থাবড়ে, দিচ্ছি কষে চড়।

মেলায় আছি। খেলেও আসি। সুযোগ যেমন পাই।
ট্র্যাডিশন আর আর্কাইভে আমার জুড়ি নাই।
মিটিং মিছিল তাও করেছি। লড়ছি লড়াই কতো!
করছি সবই বুদ্ধি-বীজী বয়স বাড়ছে যতো।

মালিশ-ম্যাসেজ দলাই-মালাই সুযোগ বুঝে কোপ।
নরমে আছি। গরমে আছি। প্রয়োজনে টোপ।
দেখছি উল্টে। দেখছি পাল্টে। দেখছি বিশ্ব জুড়ে।
দেখছি যতোই, ভাবছি ততোই - “আমি ভবঘুরে।”

পা চালিয়ে



ভাবছি এবার বর্মগুলো একে একে নেবই খুলে
সাজানো ছিলো যা কিছু তাও, ভোরের বেলার বকুল ফুলে

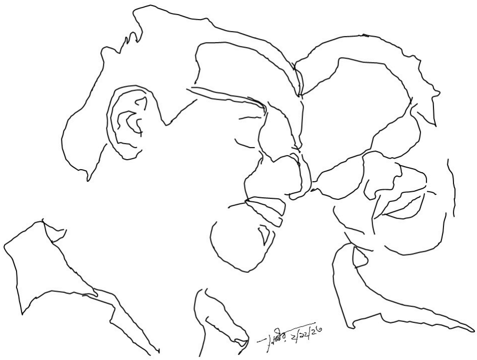
বাতাস ভেঙে রৌদ্রে ধুয়ে আদুর গায়ে মনটা সেঁকে
দৃষ্টি বধির নুব্জ ঘ্রাণে মিশবে শরীর নদীর বাঁকে

কানের পাড়ে ভাঙবে ছবি, চোখের ধারে কথা
তীক্ষ্ণ নখর, উষ্ণ বাখর, গন্ধে এবার ব্যাথা

সাঁঝের প্রদীপ উঠলে জ্বলে ধূপের ধোঁয়ায় চোখটা জ্বেলে
ছায়াপথের কোন সে নাবিক বলবে হেঁকে 'পা চালিয়ে-এ-এ'

বন্ধু! এবার পা চালিয়ে...

লোকটা ১: তৎসম আর তদ্ভবেতে



লোকটা দিব্যি ছিলো।
খাচ্ছিলো। আর ঘুরছিলো।
মোটামুটি বেঁচে
হামান দিয়ে ছেঁচে
দিনগুলো পার করছিলো।

লোকটা বেজায় ছিলো।
উৎপাতে। আর চিৎপাতে।
রাস্তা মেপে,
শহর দেখে,
ভিরমি খেয়েও হাসছিলো।

লোকটা ভালোও বাসছিলো।
ধূমপানে। আর, সুরতানে।
আড্ডা চায়ে,
আর তুফানে,
তিড়িং বিড়িং নাচছিলো।

আবোল তাবোল বলছিলো।
হাট্টিমাটিম খেলছিলো।
কতো কিই না করছিলো!
লটারিও কাটছিলো।

হঠাৎ করে, রোগটা কষে,
মুণ্ডু ঘষে, ধরলো এসে।
ছন্দে ছেঁটে,
ছড়ায় কুটে,
হিজিবিজি লিখলো শেষে।

লোকটা ছড়াই কাটছিলো।
লোকটা ছড়াও খাচ্ছিলো।
নিঃশ্বাসেতে টেনে,
কাজল দিয়ে মেখে,
অন্য ছড়াও লিখছিলো।

তৎসম আর তদ্ভবেতে

তাইতো লড়াই বাঁধছিলো

ছন্দ ছড়ার কাঁথায়

মাপের মধ্যে শব্দ গুঁজে, বলতে যা চাও কিছু,
ধ্বনির সাথে মাত্রা মেনে চলবে পিছু পিছু।

ছন্দ যতি পর্ব অতি বিষয় কিন্তু জটিল
ঘাতের মতই মাত্রা চরণ, জরুরি অন্ত্যমিল।

স্বর মাত্রা অক্ষরেতে বৃত্ত তৈরি কতোই!
জানবে তুমি-ই ভাবনাগুলো চক্রব্যূহের মতোই।

পেত্রারকীয়? শেক্সপীরিয়? ফরাসি? - যা না কিছুই হও।
উতল দেশের মুখের কথা ছড়ায় তুমি কও।

অর্থহীনের দ্ব্যর্থভাষায় মুখোশ দিয়ে ঢেকে,
তুমিই পাগল এই শহরে বলবে হেঁকে হেঁকে।

অদরকারি উদ্বৃত্ত ফালতু যতো কথায়,
তোমার শরীর ঢাকা পড়ুক ছন্দ ছড়ার কাঁথায়।

ছড়া চরিত



❝(আমার) ফুরিয়ে গেল মটর ভাজা
বোতল হ'ল খালি
দয়াময়ী কালী❞

আমি ছড়া।	ছন্দে গড়া।
নই কবিতা।	নই গীতিকা।
কাব্য, পদ্য,	কিংবা গদ্য,
প্রবন্ধ বই।	নাটকও নই।
ভাবের ভাবনা।	মাথার জাবনা।
নইকো মান্য।	কদাচ গণ্য।
তবুও প্রখর।	তীক্ষ্ণ আকর।

আমিই কথা।　　　　　আমিই প্রথা।
আমি সোহাগ।　　　　শুরুর বেহাগ।
ছন্দে নিঝুম।　　　　শান্তির ঘুম।
তর্ক যুক্তি　　　　　থেকেও মুক্তি।
পুরস্কারে,　　　　　তিরস্কারে,
জ্ঞানের বোঝায়　　　কিংবা খোঁজায়,
লেখার স্বত্বে?　　　নেইকো শর্তে।

সনাতন আমি,　　　　চিরায়ত আমি,
বহমান তবু,　　　　সালতামামি।
লড়াই রক্তে,　　　　স্বর্গে মর্তে
পুকুর ডোবায়,　　　সাগর ডাঙায়
ছায়ার পুঞ্জে,　　　তারার গুঞ্জে,
পাহাড় টিলায়,　　　গাছের তলায়,
আমিই অছি।　　　　আমি আছি।

ধুৎতেরিকা

ধুৎতেরিকা! ভাল্লাগে না
কথা মাড়াই কল।
দিন নেই রাত্রি নেই
চলছে অনর্গল।

ছুটছে কথা, ফুটছে কথা
উল্টো কিংবা সোজা।
ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরছে কেবল
বেজায় কঠিন বোঝা।

কাগজ চোঙা অডিওমিটার
মাপছে ডেসিবেল।
মাড়াই কলের ঘড়ঘড়ানি
জগৎটা উদ্বেল।

শব্দগুলো হঠাৎ করে
হরতাল যদি ডাকে,
ছোটার কথা গুলে খেয়ে
থমকে কোথাও থাকে,

কাঁপার কথা ভুলে গিয়ে
নিথর অনুরাগে,
বাজার টাজার ভরিয়ে দিলে
নীরব অনুযোগে,

কলগুলো সব মরবে ঘুরে
গোলক ধাঁধার প্যাঁচে।
পৌঁছুবে না কারুর কথা
অন্য কারুর কাছে।

বিশেষ্য আর বিশেষণে
লাগবে ঠোকাঠুকি।
বন্ধ হবে লেখালেখি
বন্ধ টোকাটুকি।

কেজো? নাকি, ফালতু?
বিচার করবে না আর কেউ।
থমকে যাওয়া চোখের ভিড়ে
থমকানো সব ঢেউ।

ধুৎতেরিকা ধুতুরা টীকা!

মাথার ব্যারাম তাই,

অসম্ভবের রোজনামচা

যাপন করে যাই

লোকটা ২: ভালোই ছিলো



লোকটা ভালোই ছিলো।

ডাক্তার দেখে,
স্টেথো দিয়ে মেপে,
কানটাকে টেনে,
জিভটাকে টিপে,
বললে,
"ছড়া রোগে ধরেছে।
যাবেনাকো সহজে।
মাথাটাও পঁচেছে।"

তাই শুনে পোলাপান

ভ্যাক করে কেঁদেছে।

মা, দিদি, ভাই, বোন
ওঝা গুণী ডেকে,
ঝেড়ে আর ফুঁকে,
তুকে আর তাকে,
শেষ ছেড়ে দেখেছে।

শেষ আশা।
ভাবে চাষা,
বউ যদি এসে
ঠুঁটো ঝাঁটা কষে
ছড়া দেয় ছাড়িয়ে।

তবেই রক্ষে।
নয়তো ছড়িয়ে ছত্রখান,
হবে,
যদিও তো নিজে সে।
সাথে যাবে আরো কতো
হাতি ঘোড়া পালকি!
লোকটাও অদ্ভুত
সে খবর রাখে কি?

এবার বরং



এবার বরং লিখি চলো রঙ বেরঙের কথা।
সাদা কালোর বদলে আঁকি, বাঙ্ময় নীরবতা।

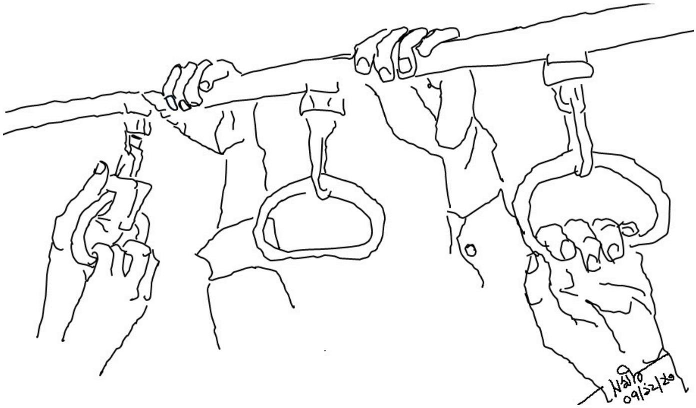
অস্তরাগের রঙে ভিজে, রাত ভোর হওয়া আলোয়,
খুঁজতে গিয়ে দেখেছি তোমায়, নিঝুম আঁধার কালোয়।

ভেঙে গেলে পরে, ছায়াপথ ঘুরে, যেন বা অবশেষ।
তেমনি হাঁটছো একাকী ক্লান্ত। অথচ, নিরুদ্দেশ।

দাঁড়াও তবে। শিশির জলে। পদ্মপাতার ধারায়।
গুটির ভিতর পিউপা যেমন রঙিন ডানার নেশায়।

জানোই যখন সবই গেছে হিংসা ঘৃণার স্রোতে।
ফিরে দাঁড়াও মৌন মুখর তেমন-ই বিপরীতে।

ভিড়



ভিড়ের মাঝে ভিড়ের কাছে ভিড়ের একটা মুখ
যায় কি চেনা, আলাদা করে? নির্বাক উন্মুখ!
বলিরেখায় ভাঙাচোরা যাপনের ইতিহাস,
তপ্ত কাঁধে পড়ছে ঢলে সুতীব্র নিঃশ্বাস।
ভূগোল ভরা, চিবুক জোড়া, সূর্যোদয়ের দেশে,
ধানের শিষের আগায় যেন অঘ্রানেরই রেশে,
ভিড়ের মাঝে, ভিড়ের কাছে, ভিড়েই ফিরে যাওয়া,
দুহাত দিয়ে জাপটে ধরে তাইতো বাঁচতে চাওয়া।
গন্ধ শেষে, যে দেশ জাগে, নোনা ঘামের ঘ্রাণে,
সেই সেখানেই উল্কা খসে নক্ষত্রেরই গানে।
ঢেউয়ের পরে, ঢেউয়ের সাজে, আলোকবর্ষ দূরে,
ভাঙছে সময়, ভাঙছে সময়, একাকী অন্তঃপুরে।

ভিড়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে তো তাই, ভিড়েই ফিরে যায়
ভিড়কে ফেলে আলাদা আর অন্য মুখ নাই।

চাওয়া

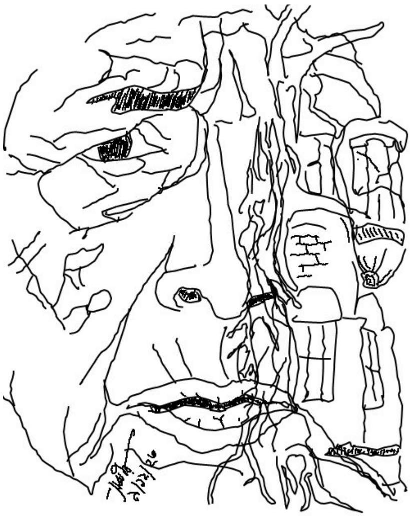


ছড়াগুলো কবিতা হতে চায়।
আর কবিতাগুলো গান।
গল্পেরা সব উপন্যাসে
খুঁজেছিল নির্বাণ।

লেখাগুলো ছবি হতে চায়।
আর ছবিরা বহমান।
কলমগুলো কালিতে ডানার
পাবে কি সন্ধান?

সে তুমি হতে চায়।
আর আমাকে ছুঁয়ে তুমি।
আমি তো কেবল চেয়েছি ছুঁতে,
জল, জঙ্গল, জমি।

লোকটা ৩: স্বীকারোক্তি



লোকটা আঁকে না। দাগিয়ে বেড়ায়।

ছবি তোলে নিঃশেষে।

ছবির মধ্যে রঙেরা যেখানে

অপরের সাথে মেশে,

ছুঁচালো চোখে সেই বরাবর

চারকোল ঘষে ঘষে

ছবিকে লোকটা ভাঙতে দেখছে

রড আর কোন কোষে।

লোকটা লেখে না। হিজিবিজি কাটে,
শব্দের প্রতিবেশে।
ধ্বনিরা যেখানে অশ্রুত হয়
আরেক ধ্বনির দেশে,
তীক্ষ্ণ কানে সেই বরাবর
চিহ্ন যতির শুষে
কথাকে লোকটা ভাঙতে শুনছে
অক্ষরেরই বিষে।

বাক্যে ও পদে শুয়ে, মৃত ভাবনারা দ্যাখে,
ছবি-শব্দও ভাঙে।
উপত্যকায় ছড়ানো ছড়ার শরীরী ইঙ্গিতে,
অসময়েরই গাঙে।

লোকটা ৪: সন্ত্রাসবাদের খপ্পরে



কেউ ভাবছে থামবে কবে?
কেউ বলছে ‘ভাগা‘।
কেউ হাসছে চোখটি টিপে,
দিন রাত্তির জাগা।

কেউ ভাসছে আনন্দেতে,
কেউবা হাসির স্রোতে।
কেউ লুটিয়ে খুনসুটিতে,
কেউবা ডিম ভাতে।

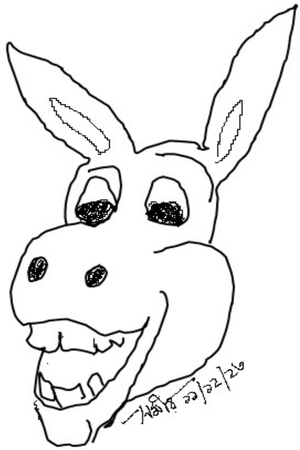
লোকটা কেবল ভাবছে বসে,
এ কি ভীষণ জ্বালা!
থামছে নাতো ছড়ার গুঁতো,
ছন্দে ফালা ফালা।

রূপ গেছে, তত্ত্ব গেছে,
অন্বয় ছারখার।
ছড়ার মতো বেয়াক্কেলের,
একি রে কারবার?

অনর্থকে আনছে টেনে
স্বভাবসিদ্ধ চালে।
প্রয়োগরীতি, বানানবিধি,
সবকিছু মগডালে।

মিচকে হাসির ফিচকেমিতে
বলছে শুধু কেসে
"দুম দুম দুম, লটাস পটাস
হিঁচাও কিচাও ইসে"

ভাষাতাত্ত্বিক



থাকার কোন শুরুও নেই।
নেই নাকি কোন শেষ?
নিখিলেরই নিরন্তরে,
ঘুরছে নির্নিমেষ।

কথার কোন টুকরোও নেই।
আছে নাকি অংশ?
সমগ্রর সাময়িকতা
কথাতেই ধ্বংস।

কথাতেই শুরু। কথাতেই শেষ।
কথার জন্যে থাকা।
যদিও কথার অন্তঃপুরে
সমস্তটাই ফাঁকা।

এই রকমই ভাবনাগুলো
দিচ্ছে হামাগুড়ি।
মত্ত ছড়ার বেয়াদপি।
প্রশ্নের সুড়সুড়ি।

অর্থ ছাড়া ধ্বনির কোন
আদৌ মানে হয়?
ভাবকে ছেড়ে বাক্যেরা সব
কি যে কথা কয়?

মানুষ ছাড়া ইতিহাসের
ঐতি-হাসি-কতা?
নিউরনে আর সাইনাপসে
খুঁজবো নাকি কথা?

ভাবছি বুঝি কথারা সব
মাথার ভিতর থাকে!

যদিও কথা বাক্য বুনে
শব্দে মাথা আঁকে!

কে কার ভিতর, কেউ জানে না
খোঁজার নেইকো শেষ
মেপেজুখে অঙ্ক কষে
হচ্ছি ক্লান্ত বেশ।

ভেবো না শুধু এসব কিছুই,
ভাষাতত্ত্বে আছে।
ভাবের গঞ্জ উজাড় হয়
হেঁয়ালিরও কাছে।

ছড়ায় ছন্দে

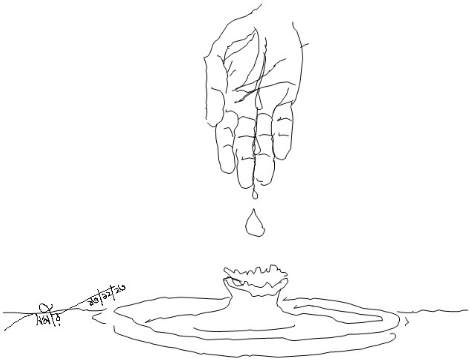
কতো যে ছড়া! লেখে কতজনে! কত রকমেরই ছন্দে!
সুরের বিহানে, জাগে গ্রহ তারা, মানুষেরই ভালো মন্দে।

আঁধার ছেঁকে, আলোর ঝোঁকে, তরল মহাশূন্যে
গুপ্তবীজী ব্যক্তজীবী জাগছে দেহারণ্যে।

ছড়াতে যেমন থাকে শব্দ, শব্দেও ছড়া থাকে।
ছড়িয়ে যাওয়া ছন্দেতে সব মানুষই ছবি আঁকে।

এই যে আকাশ! এই জঙ্গল! এই তো নদী - সাগরের তল,
ছড়ায় জাগুক। ছন্দে থাকুক। স্বচ্ছ থাকুক - পৃথিবীর জল।

অ-মিল



উপরে নেই, নিচেও নেই।
নেই বামে, নেই যে ডানে,
সামনে কিংবা পিছনেও নেই,
আছে তবে কোন খানে?

কাশেও নেই। ঘাসেও নেই।
ভিতর কিংবা বাইরেও নেই।
যা কিছু তা আছে
অকারণ কারণেই!

যার সাথে যা যায় না
তাদের জুড়ে দিয়ে তাই,
চণ্ডালীতে মিশিয়ে গুরু
দেখো ভাবেদের আসনাই।

কোথায় মান্য? কোথা নগণ্য?
কিসের উঁচু নিচু?
কালো? কিংবা, আলো?
তাতে যায় কি এসে কিছু?

ভেদের মধ্যে অভেদ যেমন,
দিগন্ততে জাগে।
মেলামেশার কারসাজিতে
অমিলও তো লাগে।

সমীক্ষক



চশমা নিয়ে নাকের ডগায়, আতস কাঁচটা হাতে,
বাইনোকুলার ঝুলিয়ে গলায়, দিনে কিংবা রাতে,
দেখো যদি কেউ ঘুরছে, ফিরছে গঞ্জ গাঁয়ের মাঠে,
পাহাড়তলি, বনের ধারে, সাগর নদীর ঘাটে।
লাইব্রেরিতেও ঘনঘন, ইন্টারনেটের দেশে,
প্রত্নজীবী গ্রন্থকীটের কখনো ছদ্মবেশে,
যত্র তত্র কলম দিয়ে, কাগজেরই গায়ে,
লিখছে কিসব ইকির মিকির, সভ্যতারই দায়ে।
শুনছে কথা। শুঁকছে মাটি। বুঝছে মানুষ - মন।
দেখছে আকাশ। খাচ্ছে বাতাস। মাপছে পাহাড় বন।

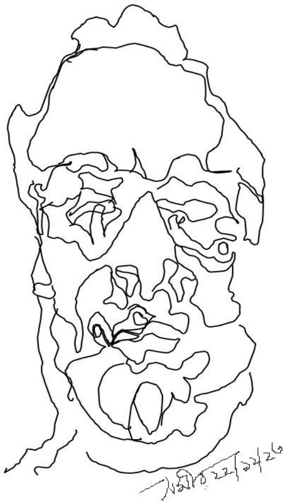
নিশ্চিত জেনো, আর কেউ নয়, লোকটা সমীক্ষক।
তোমার-আমার জল-পাহাড়ের কঠিন পরীক্ষক।

ভূতত্ত্বে ভূগোল গুলে, নরতত্ত্বে ভাষা,
সমীক্ষাতে দিচ্ছে ঠুসে জাত ধর্ম খাসা।
সংখ্যা দিয়ে ঘন্ট রাঁধে। গণেরও চচ্চড়ি।
ব্যক্তি দেশকে দাগিয়ে লিখছে 'চলচিত্তচঞ্চরি'।

ছকবাজি

খাটিয়ে মাথা ঘামিয়ে গা টিকি দাড়ি নাড়িয়ে
নাকেতে নস্যি টেনে গড়গড়া ধরিয়ে
সেই সে যে শুরুতে পড়েছিল নামতা
আজ অবশেষে এসে সেই হলো ক্ষমতা।
দুইয়ে দুইয়ে চার করে বসেছিল চাতালে
অ আ ক খ লিখে পড়ে বাজারটা মাতালে।
আর কিছু নাই হোক স্বপ্নটা দেখিয়ে
সভ্য-টা করা গেছে শিক্ষাকে চাখিয়ে।
ডিগ্রিতে ডিগ্রিতে দেশ কাল ছয়লাপ
শিক্ষাটা ব্যবসা। শিক্ষাই মাই-বাপ।
গলিঘুঁজি গিজগিজ শিক্ষক ছাত্রে
টেকসই ব্যবসায় বিনিয়োগ রাত্রে।
সেইসাথে বিপ্লব শিল্পেতে এসেছে
গাদা গাদা একই জ্ঞান বই ছেপে বেচেছে।
শিক্ষার লক্ষ্য মাপাজোখা ছাঁচেতে
মানুষটা গড়া চাই কারবার বাঁচাতে।
তবুওতো শেষ আর রক্ষা না হচ্ছে
ছাঁচে ঢালা মানুষের ছকবাজি ভাঙছে।

আঁকার আখ্যান



নিঃশব্দে তুলেছি ছবি,
মুঠো ফোনে।
রাস্তা, ঘাটে, ঘরের মধ্যে,
বাগিচায়, উঠোনে।

ভিতরে নিয়ে গেছি তুলে।
ঠিক যেভাবে গাঙচিলে
ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।
বৈদ্যুতিন স্ক্রিনে। রেখেছি টেবিলে।

অপেক্ষায় গাঢ় নিবিড়।
নিশুতি চোখে ছবির দহন।
বুলিয়েছি দৃষ্টি।
মন ভরে সন্দিগ্ধ অবগাহন।

মেরেছি রঙকে তারপর,
স্লেটে আর স্টাইলাসে।
ছায়াকে নির্বাসনে।
শুধু ছড়াকেই ভালোবেসে।

যত্নে মুছেছি ইঙ্গিত
একেকটা দাগ থেকে।
দাগেরা এখন ছড়িয়ে ছবিতে
শব্দের দিকে বেঁকে।

শুধু তোমাকেই ভালোবেসে
আজও আমি মুছি ইতিহাস।
রঙ মুছি। ছায়া মুছি। ছবি মুছি।
যদিও দাগানোটাই অভ্যাস।

শুভাকাঙ্ক্ষী



ওহে! শোনো শোনো।
মারছি না ইয়ার্কি।
চোখ কান মাথা খেয়ে,
করছোটা তুমি কি?

কাল থেকে প্রতিদিন,
তেলমাখা চুলে, চিরুনিটা দিয়ে,
(মানে, যেটুকু যা আছে টাকে)।
বসে যাবে পড়তে, বই খাতা নিয়ে।

দাঁতটাও মাজবে, জিভটাও ছুলবে,
যদি খোঁজো দ্যুতি!
সঙ্গেতে লেখালেখি। ভারি কথা। মাপা হাসি।
ভাবনারও গতি।

রোষো! রোষো! তাড়া কিসের?
আরও আছে বলবার।
প্যান্টুলে জামা গুঁজো,
সাথে জুতো চলবার।

(শোনো তবে)　　সাইকেলে, হেঁটে নয়। ট্রেনে বাসে ট্রামে সয়?
　　　　　　　　গ্যাজানোটা বন্ধ।
(যেহেতু)　　　　বয়সও বেড়েছে। চুল দাড়ি পেকেছে।
　　　　　　　　এইবারে কেটে যাক, যতো আছে ধন্ধ।

তুমি সে হও

আগে বলতো, অমুককে দেখো।
হও তমুকের মতো।
অ-ক্ষমতায় ধমকে চমকে
না জানি কিনা কি হতো!

সে সকল দিনে তবু
অমুক-তমুক ছিলো। আরও ছিলো যারা
নিকষ কালো আঁধারেতেও
হয়ে ধ্রুবতারা।

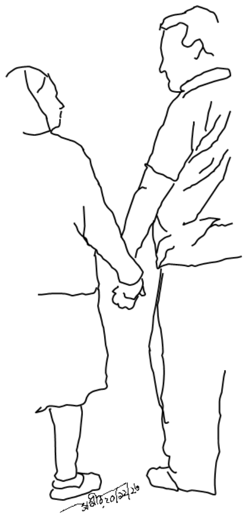
কড়িকাঠ সেদিনও ছিলো
দীঘির দিঘল ছিলো জল
সুগভীর বিশ্বাসে পাহাড়ায়
ছিলো অমুক আর তমুকের দল

বালাই চুকেছে সে সবের।
এখন নিজেকেই নিজে দেখে,
রাতের আঁধারে নিজস্বতা
কান্না নিংড়ে শেখে।

অন্যের মতো হওয়া এখন
অর্জন আর নয়।
নিজেকে পাছে খুইয়ে ফেলে
হারায় সঞ্চয়।

তদগত হয়ে তাই বলি একবার
"তৎ ত্বং অসি"
ভয়ের আগল খুলে ফেললে তবেই,
ত্বমপি ব্রহ্মাসি

রেখালেখ



একটা লেখা এমন হবে - শাল পিয়ালের কথা।
একটা রেখা উচ্চারণে ভাঙবে নীরবতা।

একটা লেখায় থাকবে লেগে জন্মজলের দাগ।
একটা রেখায় উঠুক জ্বলে গভীর অস্তরাগ।

একটা লেখা হঠাৎ রাগে এলোমেলো থাক।
একটা রেখা ভালোবেসে অনন্তকে পাক।

একটা লেখা উড়কি ধানে, একটা লেখা কৃষ্টি,
খই না-হওয়া বিন্নি ধানে, একটা রেখা, সৃষ্টি।

একটা লেখায় পড়ুক ভেঙে নিজের যতো মূর্তি।
একটা রেখা আগুন হয়ে জ্বালুক আলোকবর্তি।

তৎ



তৎ-ত্ব মানে যদি সেই সং-ক্রান্ত
গোটা কয় পণ্ডিত এই বেলা আন্ তো।
শর্মা, মালাকার, দাশ, নাথ, গুপ্ত
চৌধুরী, ভাদুড়ী, আরো যারা উপ্ত।
পদবীতে 'চ্যাটা' 'ব্যানা' যদি দেখো আর্জি
যাকে পাবে তাকে এনো যেমনটা মর্জি।
সবগুলো জড়ো হলে নাকে দিও নস্যি
ভুলো নাকো খেতে দিতে ভাঁড়ে করে লস্যি।

জিগায়িও তারপর তেনাদের একবার
তৎ-কালে কোন কাল, কোন মাস, দিন-বার?

পুরুষের সাথে তৎ, কার কথা বলছে?
তৎ সৎ আউড়ে কি যে কি বুঝছে?
তৎ-বাচী তর্জনি, কেন যেন নাচিয়ে,
নেই যদি কোনো কিছু, তোলে কাকে জাগিয়ে?
সমাধান পেতে চায় গুরুতর চেষ্টা
তৎ-ময় জ্ঞান যোগে তবে মেটে তেষ্টা।

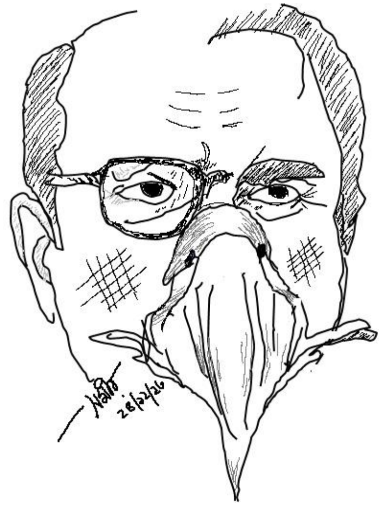
শব্দবাজি



কাজ আর কাজীতে লেগে গেছে ঝগড়া।
ব্যাধ? নাকি, ব্যাধি? কোনটা তাগড়া?
তন্ত্রীতে ছিলো আঁকা কোন এক তন্ত্র?
যন্ত্রীকে বাঁধতে, লাগে কেন যন্ত্র?
বলো দেখি, কে বড়? মন্ত্র? না, মন্ত্রী?
পত্র শুনেছো। শুনেছো কি পত্রী?
মাত্র-তে আছে কোন বলো দেখি মাত্রা?
যাত্রী কি পৌঁছবে শেষ হলে যাত্রা?
শব্দতে থাকে পড়ে কোনো এক শাব্দিক।

ব্যক্তকে ছাপিয়ে, তবে নৈর্ব্যক্তিক!
গোঁফ নিয়ে যতো গুঁফো, টাকওয়ালা টাকি
দাঁত দিয়ে দাঁতালো দিয়ে গেলো ফাঁকি।
বুদ্ধিতে জীবিত আছে যারা যতো,
শব্দতে বাজি ধরে জুয়াড়ির মতো।
বাজ আর বাজি জেনো হয় নাকো ভিন্ন
পথভোলা চিহ্নিত আলোকেরই চিহ্ন।

আপদ



কুমিরটা এনেছে,
অবশেষে কেটে খাল।
মন নাই, হুঁশ নাই,
রাজ্যেতে এক পাল।

প্রতিদিন ভোরে উঠে
পাল দেয় হুংকার।
বাক্যের ঝড়ে বাজে
ঘন ঘন টংকার।

তার সাথে জুটেছে
আরও এক সরকার।
কি কি চায়? কেন চায়?
আর কি যে দরকার?

এই নিয়ে প্রতিদিন
লাগে জোর তরজা।
জানালার কাঁচ কাঁপে
কাঁপে খাট দরজা।

ছাগলের কতিপয়
আরো যারা সন্তান।
বন্ধকী কারবারে
খুইয়েছে সব কান।

বাগচী বা মণ্ডল
দে দাম দত্ত,
নাথ দেব সিংহ
ভাদুড়ী বা গুপ্ত।

সকলেই চুপচাপ।
ভয় ভীতি ভাবনায়!

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখে

পদবীর অন্যায়।

লোকটা ৫: সহযাত্রী



“একটু চেপে। দেখুন দেখি,
জায়গা যদি হয়।”
বললে হেসে খানিক কেসে
মনেতে সংশয়।

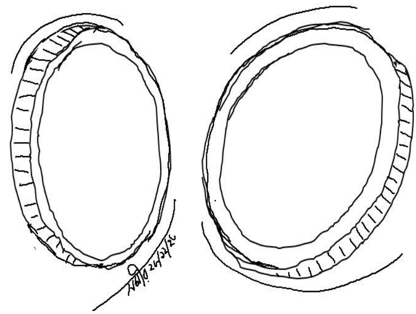
"চাপবো কোথা?" - প্রত্যুত্তরে।
"জায়গা আছে নাকি?
চারজনেতে বসলে পরে
জায়গা থাকে বাকি?"

"এই যে দাদা! ঠ্যাংটা নামান।
ব্যাগটা কোলে নিন।
বাড়তে বয়স, কাঁপছে হাঁটু,
একটু জায়গা দিন।"

বসতে পেয়েই লোকটা এবার
মিচকি হাসি হেসে,
আরাম করে ঝাল মুড়িটা,
দিয়ে মুখে ঠেসে

করলে মনে ওই কথাটা:
"যদি সুজন হয়,
তেঁতুল পাতাও ন জনাকে
অনায়াসে বয়।"
(মূল কথা: "যদি হও সুজন, তেঁতুল পাতায় ন জন।")

চাকতি-মাহাত্ম্য



সবটাই ব্যওসা। কেনা আর বেচা।
সবটাই বিনিময়। মূল্যতে বাঁচা।
অর্থের চাকতিটা কতো জোরে ঘুরবে
তাই দিয়ে নিজেদের দামটুকু বুঝবে।

চাকতির ঘূর্ণনে জাগে যেটা সর্পিল
সেটাতেই সক্কলে। আমরাও উন্মীল।
বন্ বন্ শন্ শন্ ঘোরে জোর চাকতি
কেটে ছেঁটে মেপে টেপে গড়ছে যে ব্যক্তি।

কারো দাম চার আনা। কেউ চার লক্ষ।
কেউ যদি পক্ষ তো কেউ নিরপেক্ষ।

চাকতির ঘূর্ণনে লাগে আরো মশলা
ডান, বাম, গেরুয়া, লাল, নীল, কমলা।

ফিচকেমি, আঁতলামি, গুণ্ডামি, প্রথা,
জাত, জাতি, বর্ণের আ-দি-খ্যেতা।
বেদ, পুঁজি, লিঙ্গ, ইজমের ঘ্রাণে,
পরিচিতি, পলিটিক্স, শিল্প, ও গানে,

মৌলিক মানুষের হরকরকম্বা।
ভাষা পেশা ধর্মের লাইনও লম্বা।
রেডিকাল, লিবারাল, আর ঘেঁচু সর্দার,
সকলেই বিকোবে। সময়টা দরকার।

চাকতির নিয়মে চাকতিরই খেলা
চাকতির দিনকাল, চাকতির মেলা।
প্রত্যেকে আলাদা নিজেদের ভাবছে,
আসলেতো চাকতি লাভ ক্ষতি গুনছে।

লোকটা ৬: “প্রশ্নগুলো সহজ”



কোবতে আমার। গদ্য আমার। আমারই তো পদ্য।
ছবি আমার। গান আমার। আমারই প্রবন্ধ।
আমার গাড়ি। আমার বাড়ি। আমার যতো ধন্ধ,
আমার শরীর, আমার মন - আমারই নির্বন্ধ।

সবই যদি আমার হবে, চন্দ্র-সূর্য কার,
বাতাস রাত্রি আলোক গন্ধী যা কিছু আছে আর?
কার জল? কার বৃষ্টি? জন্ম-মৃত্যু কার?
কোন তত্ত্ব? কিসের স্বত্ব? কেন অধিকার?

পরের ঘরে বসত। আর, ধার করে দিন বাঁচি।
পরের কথায় লেখালেখি, পরের ছবিই আঁকি।
পরের রঙে রাঙিয়ে শরীর সকাল সন্ধে সাজি
কেমন করে আমি তবে আমারই যে থাকি?

মানে নেই



মুখ আর মুখোশের অদ্ভুত মেলা
ছন্দের খোলোসে শব্দের খেলা।
ছায়া দিয়ে আলো লেখা, কালো দিয়ে রেখা
চোখ দিয়ে শোনা আর কান দিয়ে দেখা।

মুখ যদি মুখোশের হয় পরিচয়
ছন্দেরা শব্দের প্রাণ অতিশয়
আলো গাঁথা সরণিতে ছায়াছবি আঁকা
শূন্যের দৃকপাতে দৃশ্যেরা ফাঁকা

মানে যদি খোঁজো সেই খোলোসের ভীড়ে
শব্দের বসতি ধ্বনিদের নীড়ে।
দেখবে তো কিছু নেই, নেই কিছু স্বরে
খসে পড়া তারা যেন কথাদের ঘরে!

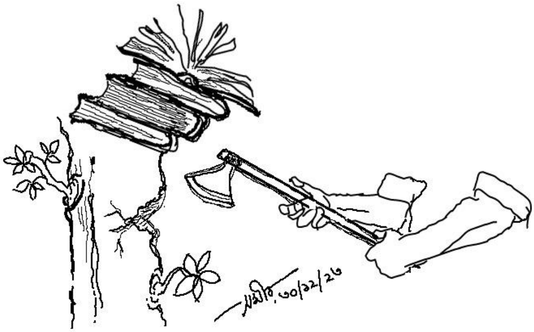
চোখ দিয়ে শুনে, আর কান দিয়ে দেখে,
মুখ দিয়ে শুঁকে, আর নাক দিয়ে চেখে,
হওয়াবাড়ি আঁকছি কার নির্দেশে?
দিশাহীন নীহারিকা জাগে রাতশেষে।

যদি তবু

সত্যই শেষ কথা যদি তাই হয়,
বসতিতে মিথ্যেরা কি কথা কয়?
সততায় মূলধন তাই বলো যদি,
অসতের কারসাজি কেন নিরবধি?
জ্ঞান যদি জগতের হয়ে থাকে প্রাণ,
সবকিছু কেন তবে সেই নির্জ্ঞান?
বোধ ব'লে যদি, থেকে থাকে কিছু।
নির্বোধে বোধ কেন নিয়েছে যে পিছু?
জন্মতে যদি শুরু মৃত্যুতে শেষ
ইচ্ছেটা তবু কেন হওয়ার অশেষ?

যদি আর তবুদের বাঁধ ভাঙা ভীড়ে
ভাবনারা মেলে এসে বৈদিক মীড়ে।
সব যদি মায়া তবু কাকে ছুঁতে চাওয়া?
ঘৃণাকেই ভালোবেসে ভালোবাসা পাওয়া।
শব্দই যদি বলো সব ছবি আঁকে
ছায়াপথ চুপচাপ কেন তবু থাকে?

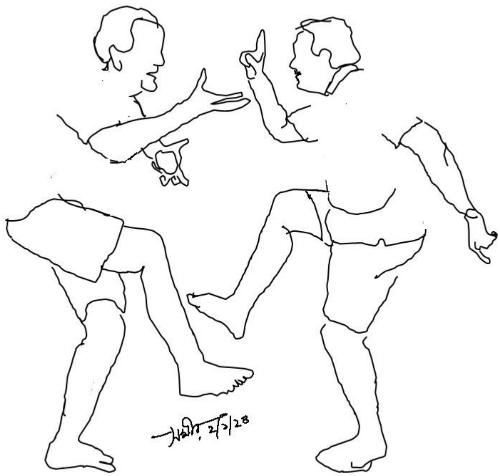
হননজীবী



পাতায় পাতায় পল্লবিত, গাছের ডালে ডালে,
ভাবনারা সব বাসা বেঁধে আড়ালে আবডালে।
ভাবনাদেরও পর্ব থাকে। থাকে শাখা সন্ধি।
পিতৃপুরুষ, ছানাপোনা, ভাবনার অনুবন্ধি।

গাছের মতোই ভাবনাগুলো উদ্বাহু দুই হাতে,
আকাশ জোড়া শূন্যতাকে চায় যে শুধু পেতে।
গাছের মধ্যে ভাবনারা শব বৃক্ষের সন্ধানে,
গাছকে কেটে বই হয়েছে দারুন অভিমানে!

তরজা



আমি:	লিখলে যদি সেই লেখাটা
রাগবে লোকে জানো
রগড় করে সেই লেখাটাই
লিখছো তুমি কেন?

তুমি:	রাগবে বলে জানলে পরে
কেউ কি কিছু লেখে?
বুজকুড়িতে জাগে মাথা
রকম সকম দেখে!

আমি: নিজেকে খুব বোদ্ধা ভাবো?
ভাবছো বুদ্ধিমান?
আসলে তো পাঁকে জাত
আস্ত শয়তান।

তুমি: বুদ্ধিটুকু থাকলে পরে
ছড়া কি আর লিখি?
ছন্দটাকে বাহন করে
আদব-কেতা শিখি?

আমি: সত্যি বলছি! কি যে লেখো?
ছড়া? নাকি, পোষ্টার?
পড়বে কি খোকা খুকু?
কেরানী? বা, মাস্টার?
ছন্দেও মাঝেসাঝে
দেখি যেন বিভ্রাট!
শব্দের ল্যাজে মুড়ো
কি কি করো কাট ছাঁট!

তুমি: বালাই সাট! পড়বে কেন?
পড়ার লেখা অন্য।

মস্ত দামে বিকোয় সেটা
বুদ্ধি চাষের জন্য।

আমি: আঁকও দেখি। মুণ্ডু! মুখোশ!
অসভ্যের ধাড়ি!
প্রেম বিরহ অনুযোগের
চলছে কি মহামারী?
রাত্রি জেগে তারপরেতে
"লাইক" তুমি গোনো।
চার দশে সাত পেরিয়ে গেল,
এবার কথা শোনো।

তুমি: আমিতো ভাই "লাইক" গুনি।
তোমরা গোনো কি?
সংস্করণ সম্বর্ধনা
আরও কতো কি!
মাথার পেছন দিব্য বলয়
প্রচুর আলোর ছটা।
"মিট দ্য অথর" কেন্দ্রে রাজ্যে
দরকারী ঘনঘটা!

এসে মেশে



শুরু এসে শেষে মেশে
শেষ এসে শুরুতে
মন্দেরও মেশা ভালো
চণ্ডালও গুরুতে

দিন এসে রাতে মেশে
রাত মেশে দিনেতে

মেঘ তাই মাটি খোঁজে
দিক জাগে শেষেতে

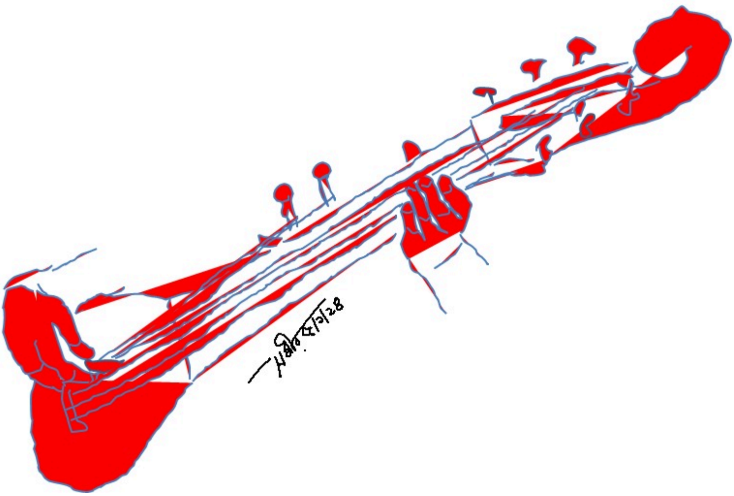
জল এসে স্রোতে মেশে
স্রোত মেশে জলেতে
অকুলের কিনারায়
হাওয়া ভাঙে ঢেউয়েতে

বৈঠাতে পাল সাধা
প্রত্যয় হালেতে
প্রাশনের অন্নও
সেই মেশে চিতাতে।

মুঠো হাতে রাগ মেশে
পা মেশে পথেতে
পেতে গেলে চাওয়া চায়
মাঠ মেশে ঘাটেতে

বাকি থাকে যেটুকুর
এসে মেশা সমেতে
শূন্যের কোলাহলে
আমি মিশি তোমাতে

শারীরিক



কাঠ দিয়ে তৈরি চামড়াতে মোড়া
তার দিয়ে টেনে বাঁধা ধাতুওতে গড়া
এক দিকে লম্বা এক দিকে মোটা
কোনো খানে সরু-বেঁটে যন্ত্রটা গোটা

ধড় বাটি মুগা কান সবকিছু মেলে
মোগরায় আকিরা শেষে অবহেলে।
বোম সুর জিন কাটি ঘোড়া দিয়ে টেনে
সবই আছে ঠিকঠাক সবকিছু মেনে।

থাকা তবু থাকা হয় শব্দের গুনে।
শব্দ কি আছে নাকি, দেখেছো কি শুনে?
শব্দের বাড়ি কোথা? থাকে কোনখানে?
যন্ত্রের শরীরে কি তার মানে?

978-93-6128-526-4